উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের সর্বোচ্চ ফল নিশ্চিত করতে স্থানীয়করণের বিকল্প নাই

স্থানীয়করণের জন্য চাই সিএসও-এনজিও বৃহত্তর ঐক্য

১. ভূমিকা

পৃথিবীতে দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপনিবেশবাদ অবসানের সঙ্গে জন্মলাভ করে নতুন নতুন জাতিরাষ্ট্র। প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রকট বৈষম্য, সংজ্ঞায়ন হয় উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশ- ইত্যাদি পরিচয়। এরই সূত্র ধরে প্রয়োজন দেখা দেয় অনুন্নত, বিশেষ করে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশসমূহে উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের। প্রথম দিকে এই উন্নয়ন সহায়তা উন্নত দেশের দানশীলতা হিসেবে দেখা হলেও ক্রমেই পরিষ্কার হয়, এই বৈষম্যের জন্য দায়ী উপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেসব দেশ স্বল্পোন্নত, দারিদ্রপীড়িত হিসেবে আবির্ভূত হয়, দেখা যায় সেসব দেশ থেকেই মূলত সম্পদ আহরণের মাধ্যমে ধনী হয়ে ওঠে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ। ফলে, উন্নয়ন সহায়তাকে আর কোনোভাবেই দাতব্য বলার অবকাশ থাকে না। এটি বরং তাদের ঐতিহাসিক দায়।

২. উন্নয়ন সহায়তার উৎস

উন্নত দেশ বা দাতা দেশসমূহ পৃথিবীতে দারিদ্র বিমোচনসহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি মানব উন্নয়নের জন্য যে তহবিল প্রদান করে থাকে তার মূল উৎস উক্ত দেশসমূহের করদাতা জনগণ। রপ্তানি বাণিজ্যসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ও এর অন্যতম উৎস, যার মালিকানা আবার ঘুরেফিরে সেসব দেশের জনগণই। দরিদ্র দেশের ততধিক দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নই তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা। উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের সর্বোচ্চ অংশ দরিদ্র মানুষের হাতে সরাসরি পৌঁছানোর ব্যাপারে তাদের বক্তব্য সম্প্রতি উঠে এসেছে 'গ্রান্ড বারগেইন' নামের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে।

দাতা দেশসমূহের সমন্বয় সংস্থা ওইসিডি (অরগানাইজেশন অব ইকোনমিক কোঅপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট) তাদের ২০১৭ সালের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে বলেছে, ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তার মোট পরিমাণ ১৪৩ বিলিয়ন ডলার যা, ২০১০ সালের তুলনায় ১৯% বেশি এবং ২০০০ সালের তুলনায় ১০২% বেশি। বলা হয়েছে, এই উন্নয়ন সহায়তা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে (সূত্র: ওইসিডি, ২০১৭)। দেশ ও বছর ভেদে এই তহবিলের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হচ্ছে ওডিএ বা আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা যা সরকারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। বাকিটা মানবিক সহায়তা ও বেসরকারি চ্যানেলে এনজিওর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৩. উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের সংকট

এই বিপুল পরিমাণ তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে দাতা দেশসমূহের নিজস্ব আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিও। এই সংস্থাসমূহের পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় অত্যন্ত বিপুল এবং সারা বিশ্বে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। এদিকে, এই ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের কোনো পরিসংখ্যান কেউ প্রকাশ করছে না। এমনকি অনেক উন্নয়ন গবেষক বা অডিট সংস্থাও তা ঠিকভাবে বের করতে পারেননি।

সম্প্রতি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে রোহিঙ্গা সমস্যার জাতীয় টাস্ক ফোর্সের (এনটিএফ) ২৬তম সভার আলোচনায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশে জাতিসংঘের সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তহবিলের ব্যবস্থাপনা ব্যয় প্রায় ৬৫% এবং যাদের জন্য তহবিল, তাদের উপকারার্থে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ৩৫% (*সূত্র: প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১৯, ভাসানচর না থাকলে জেআরপিতে জাতিসংঘকে সহায়তা নয়*)। বৈঠকে আরো বলা হয়, এই রোগিঙ্গা সাড়াপ্রদানের জন্য ২০১৯ সালে যা ব্যয় হবে তার মাত্র ৩৫% তহবিল যোগাড় হয়েছে, বাকি তহবিলের কোনো প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত নেই।

সভায় আলোচিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সংবাদ মাধ্যমেও উঠে এসেছে, সেটি হচ্ছে, এই তহবিল ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কোনো স্বচ্ছতা নাই। এমনকি এ বিষয়ে কোথাও অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও নেই।

সর্বজনস্বীকৃত ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, 'ডেভেলপমেন্ট পলিসি রিভিউ'- ২০১২ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গবেষক ফ্রিদা ভ্যানদেনিন্দেন এবং এলিজাবেথ পল উল্লেখ করেন, উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের লেনদেন ব্যয় (ট্রানজেকশন কস্ট) অত্যন্ত বেশি ও নিয়ন্ত্রণের অতীত। এর দুটি প্রধান খাতের মধ্যে রয়েছে তহবিল পরিচালনাকারী সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয় (অফিস, পরিবহন, বেতন-ভাতা ইত্যাদি) এবং গ্রহিতা সরকারের দুর্নীতি, যার কোনোটারই স্বচ্ছতা বা সঠিক পরিমাণ আজ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ২০০২ থেকে ২০১২ পর্যন্ত কয়েক দফা চেষ্টায় এটাই প্রতীয়মান হয়েছে, এই ব্যয় নির্ধারণের জন্য যত পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয়েছে, তার সবগুলোই নিজেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শেষ পর্যন্ত তা লেনদেন ব্যয় আরো বাড়ায় এবং চূড়ান্ত গ্রহিতার হাতে সরাসরি অর্থের ভাগ আরো হ্রাস পায়।

৪. তহবিলের স্থানীয়করণ

তহবিলের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং লেনদেন ব্যয় কমানোর জন্য বিশ্বব্যাপী অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং অনেক উদ্যোগও গ্রহন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে 'এইড ইফেকটিভনেস' প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, এর সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, তা মূলত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মনিটরিং-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তহবিল প্রদানের ফলে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর আদৌ কোনো উপকার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে এর কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। সে কারণেই বিশ্বব্যাপী আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস। সরকারের পাশাপাশি উন্নয়নের সকল অংশিদার যেমন বাণিজ্য খাত, এনজিও-সিএসও, ট্রেড ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সেক্টর এতে যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত জিপিইডিসি (গ্লোবাল প্লাটফরম ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট

কোঅপারেশন) নামে একটি বৃহত্তর প্লাটফরম প্রতিষ্ঠিত হয়, যার বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন যৌথভাবে বাংলাদেশ, উগান্ডা ও জার্মানির অর্থমন্ত্রীগণ।

আরো একটি বৈশ্বিক আলোচনা প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের নেতৃত্বে, যার মূল মনোযোগ ছিল বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তার প্রক্রিয়া। ২০১৬ সালের ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটে আন্তর্জাতিক সহায়তা তহবিলের সংকট ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও নানা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

৫. আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি: গ্রান্ড বারগেইন

এই ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সামনে চলে আসে যার নাম 'গ্রান্ড বারগেইন'। ২০১৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত এই ফোরামে দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ ও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আলোচনার মাধ্যমে ১০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, যা পরিমাপের জন্য ৫২টি সূচক রয়েছে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে, চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর হাতে সরাসরি অর্থ পৌঁছানোর অনুপাত বৃদ্ধি করা, লেনদেন ব্যয় কমানো এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৬. আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি: চার্টার ফর চেঞ্জ

৪৫টি দেশের প্রায় ২৩৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমর্থনে মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণ বিষয়ে ৮টি প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়, যার নাম চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫)। যার মূল বক্তব্যই হচ্ছে, স্থানীয় সংগঠনের হাতে ক্রমান্বয়ে সরাসরি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উপকার আরো বেশি ফলদায়ক হয় এবং স্থানীয় সংগঠনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. বাংলাদেশে স্থানীয় সংগঠনসমূহের সংকট ও স্থানীয়করণ আন্দোলন

যদিও উন্নয়নের প্রধান রূপকার সরকার, তবু বেসরকারি সংস্থা ও বাণিজ্যিক খাত এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে প্রতিষ্ঠিত জিপিইডিসি-তেও এটি স্বীকৃত। বাংলাদেশে সুশীল সমাজ সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে স্বাধীনতার পর থেকেই। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, শত বছরের পরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা ২১০০ এবং উন্নয়নের আন্তর্জাতিক লক্ষ্য এসডিজি অর্জনে সরকারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে ছোট বড় স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনসমূহ।

উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, স্থানীয় সংগঠনগুলো নানা সংকটে আবর্তিত। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- তহবিল প্রাপ্তিতে জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে অসম প্রতিযোগিতা,
- সরকারি নিবন্ধনের জটিল প্রক্রিয়া,
- সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়া,
- বিদেশি দাতা সংস্থার সাথে অস্বচ্ছ ও অসম অংশিদারিত্ব, এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা না পাওয়া,
- বিদেশি সংস্থার কাছে কর্মী হারানো, ইত্যাদি।

এসব সংকট মোকাবেলা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্টের নেতৃত্বে দেশব্যাপী একটি প্রচারাভিযান শুরুর উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। ঢাকাসহ ৮টি বিভাগে কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠনের নেতৃত্বে আত্মমর্যাদাশীল স্থানীয় সিএসও-এনজিও সেক্টর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠন করা হয় বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি সিএসও-এনজিও সেক্টর গড়ে তোলা যারা সরকার ও বাণিজ্যিক খাতের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করবে এবং দেশে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতার একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।

৮. আমাদের কর্মকাণ্ড ও অবদান

৮টি বিভাগীয় কর্মশালার পর জেলা পর্যায়ে ১১টি কর্মশালা আয়োজন করে বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া, যার ফসল হিসেবে ঢাকায় গত ৬ জুলাই ২০১৯ একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহন করে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত ৭০০ এনজিও ও সামাজিক সংগঠন, ৮টি দেশের ২০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, যারা বিশ্বব্যাপী ও নিজ দেশে স্থানীয়করণ প্রচারাভিযানে যুক্ত এবং উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার নানা উদ্যোগের সাথে জড়িত।

৯. জবাবদিহিতা ঘোষণা ও প্রত্যাশার সনদ

৬ জুলাই ২০১৯ জাতীয় সম্মেলনে স্থানীয় সিএসও-এনজিও তাদের নিজেদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য ৮টি ধারার একটি জবাবদিহিতা সনদ ঘোষণা করে, যেখানে তারা উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, স্থানীয় ও জাতীয় সরকার এবং দাতা সংস্থার কাছে তারা কিভাবে জবাবদিহিতা করবে এবং নিজেদের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করবে।

পাশাপাশি তারা সরকার, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে তাদের প্রত্যাশা নিয়েও ১৮ দফার একটি প্রত্যাশার সনদ ঘোষণা করে। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজিকরণ, সমান ও জবাবদিহিতামূলক অংশিদারিত্ব, আন্তর্জাতিক ও দাতা সংস্থার কোনো অনিয়মে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ, স্থানীয় সংস্থা থেকে কর্মী নিয়োগ দানের স্বচ্ছ ও ন্যায্য প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরবরাহকেন্দ্রিক না হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সংগঠনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া ইত্যাদি।

১০. উপসংহার

আজকের সংবাদ সম্মেলনে আমরা দায়বদ্ধতা ও প্রত্যাশার সনদ তুলে ধরছি। আমাদের প্রত্যাশার সারমর্ম হচ্ছে সিএসও-এনজিওর বিকাশে স্থানীয়করণের কোনো বিকল্প নেই। সিএসও-এনজিও'র করপোরেটাইজেশন অর্থাৎ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ আমাদের কাম্য নয়। আত্মমর্যাদার সাথে নেতৃত্ব নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য দেশে সিএসও-এনজিও বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন। স্থানীয় সিএসও-এনজিও শুধু জাতিসংঘের সংস্থা বা আন্তর্জাতিক এনজিও-র কাছ থেকে নয়, সরকারের কাছ থেকেও মর্যাদা ও স্বীকৃতি দাবি করবে।

বাংলাদেশ সিএসও-এনজিও সমন্বয় প্রক্রিয়া

সচিবায়লয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮৪০ (বরকত উল্লাহ মারুফ), ০১৭১১৪৫৫৫৯১ (মোস্তফা কামাল আকন্দ) ওয়েব: www.bd-cso-ngo.net।